

হিমালীশ গোস্বামীৰ গল্প : হাসিৰ আয়নাৰ সমাজেৰ চালচিত্ৰ
অন্তৰা চৌধুৰি

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/20_Antara-Chaudhuri.pdf

সারসংক্ষেপ: জীৱনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে হাসিৰ উপাদান। তাকে দূৰ থেকে দেখা নয়। বরং, আরো কাছ থেকে দেখো। সম্ভব হলে নিজেও তাতে शामिल হয়ে যাও। এটাই হিমালীশ গোস্বামীৰ লেখাৰ পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। হাসি কোথায় আছে, আর কোথায় নেই, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব চিরন্তন। কিন্তু তাঁর রসিক মন অনেক জটিল বিষয়ের মধ্যেও হাসিৰ উপাদান ঠিক খুঁজে নিয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজেৰ নানা অসংজ্ঞাতি, হয়তো রাগেৰ উপাদান হতে পারত কিন্তু তাকে তিনি নিয়ে এসেছেন হাসিৰ মোড়কে। ব্যঞ্জেৰ মাঝে হাসি, হাসিৰ মাঝেই ব্যঙ্গ। আমাদেৰ প্ৰচলিত ধাৰণাৰ বাইৰে গিয়ে নিৰ্মাণ কৰেছেন অন্য এক কক্ষপথ। বিচিত্ৰ নাম, বিচিত্ৰ ঘটনা, বিচিত্ৰ তাৰ বিশ্লেষণ। তিনি ভাবনাৰ নতুন জানালা খুলে দিয়েছেন। অন্যকে নিয়ে হাসতে তো সবাই পারে। কিন্তু তিনি নিজেকে নিয়েও হাসেন, নিজেকেও হাসিৰ চৰিত্ৰ কৰে তোলেন। তাতে তাঁৰ গল্পেৰ বিশ্বাসযোগ্যতা যেমন বাড়ে, তেমনি একাধা হয়ে ওঠাৰ একটা পৰিসৰও তৈৰি হয়। বৰ্তমান প্ৰবন্ধে হিমালীশ গোস্বামীৰ বেশ কিছু নিৰ্বাচিত গল্প অবলম্বনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কৰা হয়েছে।

সূচক শব্দ: হিমালীশ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ভাৰতীয় হাইকমিশন, ব্যঙ্গ, সমাজ, অসংজ্ঞাতি, Pun, হিউমাৰ, দুৰ্নীতি, বিদ্ৰূপ, জালিয়াতি, ফাঁকি, সৎ, ব্যঞ্জন, ভিজিলেন্স অফিসাৰ, দাৰুওয়ালা, কলুষমুক্ত।

স্বতঃস্ফূৰ্ত রসিকতায় তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। মানুষেৰ চৰিত্ৰ ও আচৰণেৰ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ অসংজ্ঞাতি ৰচনায় তিনি পটু। ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ৰ মতোই তাঁৰ গদ্যভঙ্গি সহজ, সরল ও হাস্যৰস সৃষ্টিতে সাবলীল। তৰে তাঁৰ হাস্যৰস মূলত হিউমাৰ। স্যাটায়াৰেৰ তীব্ৰ জ্বালা তাঁৰ লেখনীতে অনুপস্থিত। হাসি বা কৌতুকৰসেৰ মূল উৎস জীৱনেৰ অসংজ্ঞাতি যা, তাঁৰ ৰচনাৰ মূল বিষয়। হিমালীশ গোস্বামীৰ জন্ম মাৰ্চ ১৮, ১৯২৬; পূৰ্ববঞ্জেৰ কালুখালি ৰেলষ্টেশনেৰ কাছে ৰতনদিয়া গ্ৰামে। তাঁৰ বাবা বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পৰিমল গোস্বামী, মা জ্যোৎস্না দেবী। ১৯৩৭ সালে মাত্ৰ এগাৰো বছৰ বয়সে হিমালীশ কলকাতায় চলে আসেন। ৰানিভবানী স্কুল থেকে ম্যাট্ৰিক পাশেৰ পৰ বিদ্যাগাৰ কলেজ থেকে ভূগোলে স্নাতক কৰে, ভাৰতীয় হাইকমিশনেৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় বিমান বাহিনীতে তৃতীয় শ্ৰেণিৰ চাকৰি কৰেন পাঁচ বছৰ। এবং হিমালীশ গোস্বামী আনন্দবাজাৰ পত্ৰিকাৰ সাব-এডিটৰ; এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্ৰকাশন উপদেষ্টা। তাৰপৰ ১৯৯১ থেকে ২০১২ পৰ্যন্ত তিনি স্বাধীন লেখক জীৱন কাটিয়েছেন। হিমালীশ ছিলেন একজন বিখ্যাত কাৰ্টুনিষ্ট হলেও বিখ্যাত রসসাহিত্যিক শিবৰাম চক্ৰবৰ্তীকে নিজেৰ গুৰু বলে মনে কৰতেন। শিবৰামেৰ আদলে তিনি একটা চৰিত্ৰ তৈৰি কৰেন, তাৰ নাম দেন জিবৰাম।

নীতিবাগীশেৰ ভূমিকায় সমাজসংস্কাৰকও নন, ব্যঞ্জেৰ তীব্ৰ কষাঘাত এনে সমাজকে কলুষমুক্ত কৰতে তিনি নাৰাজ। মানুষেৰ অসংজ্ঞাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাকে লোকসমক্ষে হাস্যাস্পদ কৰতেও তিনি নাৰাজ। খুব সহজ-সরল অনাড়ম্বৰভাবেই তাঁৰ লেখনী ‘আপন বেগে পাগলপাৰা’। সমাজ ও জীৱনেৰ বেশ কিছু টুকৰো টুকৰো মুহূৰ্তকে তিনি মুনশিয়ানায় হাস্যৰসেৰ মোড়কে তুলে ধৰেছেন। তৰে লেখকেৰ হাসিৰ গল্প ৰচনায় যে সবসময় যে দমফটানো হাসিৰ উপাদান থাকবে তা কিন্তু নয়, কখনো অল্প কথায় অল্প একটু আবেগে হাসতে হাসতে চোখে জলও আসে। ভেতৰে থাকে এক অদ্ভুত ভালোলাগা ভালোবাসা। লেখায় নাটকীয়তা, সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা জড়িয়ে থাকে জীৱনেৰ প্ৰতি পরতে পরতে। এ প্ৰসঙ্গে বৰ্ষীয়ান লেখক বলেছেন —

“গল্পকার হিমালীশ সর্বদাই যে বুঝিয়ে বলাতে বিশেষ উৎসাহী তা নয়! কখনও নামে, দু-একটা অসমাপ্ত শব্দে ইনি নিখুঁত পাসে পাঠকের অর্ধেই বলা ঠেলে দেন। সেই খেলায় তাঁর নায়িকা হন ‘দুমনা দেবী’, ‘আপামর কালু দল’-এর সহজ মানে হয় — কালচারের সবাই। আর যে দুর্লভ পত্রিকায় দুমনা দেবীদের সাংস্কৃতিক খবর ছাপা হয় তার নাম ‘নাচানাচি’ (মিলপুরের মেলা)। সংসারের অধিকাংশ সমস্যার অন্তরেও কিছু অভ্যন্তরীণ কথাবার্তা থাকে। গল্পকার হিমালীশ অনায়াসে সেইসব অন্তরস্থিত রসবার্তা জানিয়ে দেন।”

হিমালীশ গোস্বামীৰ গল্পগুলি মূলত ছ'য়ৰ দশক থেকে শুরু করে নয়ের দশক পর্যন্ত সময়সীমায় লিখিত। কাজেই এই চার দশকের বৈশিষ্ট্য তাঁর বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন আঙ্গিকে ঘুরে ফিরে এসেছে। হিমালীশের গল্পের প্রধান সুর হিউমার। হিমালীশ সমস্যা কে চিহ্নিত করলেও বিচারকের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হননি। মজার কথা হলো, হিমালীশের গল্পে যেটা সবথেকে বেশি চোখে পড়ে তা, অদ্ভুত অদ্ভুত চরিত্রের নামের সমাহার। যেমন, চলিতা দেবী, বিরাট ভদ্র, অচঞ্চলা দেবী, অপলক কুমার, দুমনা দেবী ইত্যাদি। এছাড়াও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখায় অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে। যেমন শব্দ নিয়ে খেলা অর্থাৎ pun-এর প্রবণতা। এক্ষেত্রে তাঁকে শিবরামের উত্তরসূরি বলা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন — “একদিন দাদা আমাকে নিয়ে গেলেন শিবরাম চক্রবর্তীর কাছে। তাঁর লেখা পড়ে এমনই আচ্ছন্ন হলাম, মনে মনে তাঁকেই আমার লেখার গুরু করে নিলাম।”^২ শিবরাম ও হিমালীশ দু'জনের জীবনই খুব কষ্টে কেটেছে। কিন্তু জীবন অনেক চক্রান্ত করেও তাঁদের হাসি থামাতে পারেনি। খুব অভাবের দিনেও তাঁদের মনের রসধারায় কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন —

“জীবনের মজার দিকটা দেখার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যিনি আমাকে প্রভাবিত করেছেন তিনি আমার মেজোমামা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচি। তারপরই বলতে হয় পিতৃদেব পরিমল গোস্বামীর কথা। অতঃপর অবশ্যই আমাদের পারিবারিক প্রায় অভিভাবক, সদাহাস্যময় সরসতার প্রতিমূর্তি শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে। সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকারকেও। এরপর প্রায় অনিবার্যভাবে এসে পড়েন শিবরাম চক্রবর্তী।”^৩

হিমালীশ তাঁর গল্পের পরতে পরতে ছোট দু-একটি বাক্যের মধ্যে হাসির মণিমুক্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে আগাগোড়া সুখপাঠ্য। তাঁর লেখার পদ্ধতি মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও অনুসন্ধানী। অসজ্জাতির উৎস সম্বন্ধে তিনি সদা তৎপর। এছাড়া তিনি মানুষের মহত্বে বিশ্বাসী। একটি মানুষ অবস্থার চাপে পড়ে ভুল করে কোনো কাজ করলেই যে তাকে ‘খারাপ লোক’ তকমা ঐঁটে দিতে হবে এই তত্ত্বে তিনি রাজি নন। তিনি শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভবোধের প্রতি আস্থা রেখেছেন। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে যেসব ভ্রান্তি ও অসজ্জাতি রয়েছে সেগুলি উন্মোচিত করে পাঠককে তিনি নির্মল আনন্দ দান করেছেন।

আমাদের জীবনের সব কিছুই সমাজকেন্দ্রিক। সমাজ-বহির্ভূত কিছু নয়। দৈনন্দিন জীবন থেকে রাজনীতি, জন্ম থেকে মৃত্যু সব কিছুই সমাজকে কেন্দ্র করে। তা সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার্থে সমাজের বিবর্তনকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। একদিকে যেমন উঠে এসেছে সমাজের ধ্বজাধারী রাজনীতিকদের কার্যকলাপ, সমাজের সর্বস্তরের আর্থিক দুর্নীতির চিত্র, অন্যদিকে উঠে এসেছে প্রতিদিন বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেওয়া সাধারণ মানুষের দুরাবস্থার কথা। গল্পের নাম ‘অপদার্থ’। গল্পের বিষয়টি বড়ো অদ্ভুত। দুর্নীতি করাই যখন হয়ে ওঠে মানুষের স্ট্যাটাস সিঙ্গল। স্বামী গোবিন্দপ্রকাশ ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে শ্লেভ প্রকাশ করেন তাঁর স্ত্রী অচঞ্জলা দেবী। কারণ তাঁর স্বামী কোনোরকম দুর্নীতি না করার ফলে সমাজে এবং বাপের বাড়ির লোকের কাছে তাঁর সম্মান থাকছে না। অচঞ্জলা দেবীর বোন তো তাঁর জামাইবাবুকে অপদার্থ ভাবতে শুরু করে। লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন যে, দুর্নীতি করার ফলে মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি কীভাবে বেড়ে যায়। তাই অচঞ্জলা দেবী তাঁর স্বামীকে বলেন —

“কাজ কাজ আর কাজ! ত্রিশ বছর ধরে গদাধরের মত কাজই তো করে গেলে, এ পর্যন্ত একটা ভাল কিছু করতে পারলে না। এই সময়ের মধ্যে না হল একটা ভাল পাড়ায় বাড়ি, না হল গাড়ি। আর তো রিটায়ার

করতে তিন বছরও নেই, অথচ কিছুই গোছাতে পারলে না। ওদিকে দ্যাখো রায়-হাজরা-অফিসে ঢোকার দেড় বছরের মধ্যেই কী চমৎকার একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে পৌনে দু'লাখ টাকা সরিয়ে ফেলল। তারপরই তার প্রমোশন হয়ে গেল। প্রথমে গেল বাজালোরে, সেখানে আর এক কেলেঙ্কারি, এবারে ছ'লাখের ব্যাপার, তবে দু-একজনকে আবার ভাগ দিতে হয়েছিল। তার পর বাজালোর থেকে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বর্ডারে। বাস, সেখানে গিয়ে সে নাকি এখন বছরে দশ-বিশ লাখ টাকা পকেটে করে। হ্যাঁ গা, তুমি একটা কেলেঙ্কারি করো না গো!”^৪ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এমন আবদার শুনলে আমরা হাসি কম, বিস্মিত হই অনেক বেশি। কারণ বিভিন্ন অফিসে এমন আর্থিক কেলেঙ্কারির অনেক খবরই আমাদের কারো অজানা নয়। সেখানে তদন্তের নামে একটা প্রহসন হয়, তারপর সব ধামাচাপা পড়ে যায়। আইনি জটিলতার ফাঁক এড়িয়ে অন্যত্র জাঁকিয়ে বসে দুর্নীতির ধ্বজাধারী এইসব রাঘববোয়ালরা। কিন্তু গোবিন্দপ্রকাশ ভরদ্বাজ আত্মীয় তোষণের মতো সামান্য দুর্নীতিও না করার ফলে তাঁর শ্যালিকা তাঁকে মানসিক বিকারগ্রস্ত মনে করে। স্ত্রীর ক্রমাগত বাক্যবাণে আহত হয়ে গোবিন্দবাবুর চৈতন্য হয়। তিনি তাঁর স্ত্রীকে আশ্বাস দেন এই বলে — “তুমি চঞ্চল হয়ো না অচঞ্চলা, নিশ্চিন্ত থাকো। আমি একটা কিছু করবই।”^৫ কিন্তু বিধি বাম। তিনি একের পর এক আর্থিক তহরুপ করতে লাগলেন। অফিস থেকে আট হাজার টাকা সরানোর পরেও কেউ কিছু তাঁকে বলল না। উপরন্তু তাঁর অফিসের সহকর্মীর স্ত্রী হিংসে করে বলেন — “আমরা কি বুঝি না এসবই নিজের টাকায় করা। আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? কারচুপি জালিয়াতি এসব করতে হিম্মত থাকা চাই। লোককে এমনভাবে ধোঁকা দিচ্ছেন যাতে লোকেরা মনে করে গোবিন্দপ্রকাশবাবু অফিসে দুর্নীতির ধ্বজা ধরে আছেন। একদম মিথ্যে। এও এক ধরণের পাপ। আমার স্বামী যা করেছিলেন সে করার মত হিম্মত কারুর নেই। হবেও না আর। অফিসের এগারখানা ভাল গাড়িকে চালানোর অনুপযুক্ত বলে প্রত্যেকটিকে এক হাজার তিনশ টাকা করে বিক্রি করে, পরে ঐ গাড়িগুলোকেই একটু রঙটঙ বদলে প্রত্যেকটি সাতচল্লিশ হাজার টাকায় ওই অফিসকে দিয়েই কিনিয়ে ছিলেন।... তারপরই তো গুঁর পদোন্নতি হল, তারপর পুনেতে বদলি হলেন, তারপর সেখানে এমন একটা কাণ্ড করলেন যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই নাকি শূনে চেয়ার থেকে ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন।... হুঁ বাবা, কেলেঙ্কারির জন্য যে নার্ভ লাগে সে কি সকলের থাকে নাকি?”^৬

তাঁর গল্পের সংলাপে আমাদের মনে খেলা করে এক অদ্ভুত হাসি, সে হাসিতে মিশে থাকে অনেকখানি ঘৃণা। কিন্তু এত দুর্নীতি করা সত্ত্বেও তাঁর কেলেঙ্কারি ধরা পড়ল না। কেলেঙ্কারি না হলে আবার সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া মুশকিল। কাগজে তাঁর নাম না বেরোলে মান-ইজ্জত সব ধুলোয় মিশে যাবে। তিনি যেচে অফিসের বড়কর্তাকে তাঁর টাকা সরানোর কথা বললে তিনি বলেন — “বেশ তো, সাতচল্লিশ লাখ আপনি এই অফিস থেকে সরিয়েছেন। মিটে গেল। তা আমি কী করব, নাচব?”^৭ একটি দুর্নীতির আড়ালে আরো অনেক দুর্নীতি বাসা বেঁধে থাকে এখানে এমনটাই ইজ্জিত করতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর গল্পে যারা সৎ মানুষ যারা, নিজের কাজটা ঠিকঠাক করতে চায়, সমাজের কাছে, পরিবারের কাছে তারা বোকা ও অপদার্থ হিসেবেই চিহ্নিত। তাই গোবিন্দবাবুকে কেউ আড়ালে উপহাস করে, কেউ সামনেই তিরস্কার করে, সৎ থাকাটাই যেন সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা। আর এই ব্যর্থতার তকমা মুহূর্তেই তাঁকেও শামিল হতে হয় বাকিদের দলে। খুব সুকৌশলে লেখক ইজ্জিত করেছেন, অধিকাংশ দুর্নীতির উৎস তাঁদের বাড়ি। গিল্মি ও পরিবারের চাহিদা বাড়তেই থাকে। আর এই লাগামছাড়া চাহিদা সামাল দিতে গিয়েই দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়তে হয় তাকে। স্ত্রীর চোখে নিজেকে ‘যোগ্য’ প্রমাণ করতেই হবে। এই যোগ্যতা প্রমাণ করতে গিয়েই তো অনেকে দুর্নীতির পথে পা বাড়ায়। এই প্রবণতা ছ'য়ের দশকেও ছিল। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগেও আছে। পঞ্চাশ বছর আগেই লেখক মোক্ষম একটি দিকে আলো ফেলেছিলেন, তাই পঞ্চাশ বছর পরেও এই প্রসঙ্গ সেকলে মনে হয় না, বেশ প্রাসঙ্গিকই মনে হয়।

এই গল্পেরই বিপরীত গল্প ‘বিবেকের তৃতীয় আক্রমণ’। বনমালীবাবুর মধ্যে হঠাৎ করে বিবেকের আক্রমণ হয়। এই আক্রমণ হওয়ার ফলে তিনি হঠাৎ করে অসৎ থেকে সৎ হয়ে যান। সারা জীবনে তিনি যা

কিছু দুৰ্নীতি কৰেহেন বিবেকেৰ আক্ৰমণেৰ ফলে তিনি সব কিছু সুদে আসলে ফেৰত দিতে চান। তাঁৰ সাফ কথা —

“অনেক অপৰাধ কৰেছি, আর নয়। গত কুড়ি বছর ধরে দৈনিক দু’ঘণ্টা ফাঁকি দিয়েছি কাজে। যেমন দেৰি কৰে গিয়েছি, তেমনি অনেক আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছি। বছরে তিনশো দিনে ছশো ঘণ্টা, কুড়ি বছরে বার হাজার ঘণ্টা, তা ঘণ্টায় দশ টাকা ধরলেও ফাঁকি দিয়েছি এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। আমি তো চোর! কাকে ফাঁকি দিয়েছি? আমাদের দেশের লোককে। আর নয়।”^৮

সৎ হবো বললেই তো আর অত সহজে সৎ হওয়া যায় না। গোটা সমাজটাই যখন দুৰ্নীতিৰ পাকৈ নিমজ্জিত তখন সমাজে একজনের পক্ষে সততার ধ্বজা ধরে থাকা খুবই মুশকিল। ঘড়ি যেমন উল্টো দিকে চলতে থাকলে সকলেই অবাক হয়ে যায়, তেমন বনমালীবাবুও হঠাৎ কৰে ‘সৎ’ হয়ে যাওয়ায় সকলে তাঁকে মানসিক রোগী ভাবতে শুরু কৰে। বনমালীবাবু এক এক কৰে তাঁৰ ক্ষতিপূৰণ কৰতে শুরু কৰেন। প্রথমত তিনি হিসেব কৰে দেখেহেন কুড়ি বছরের কর্মজীবনে তিনি মোটামুটি বারো হাজার ঘণ্টা ফাঁকি দিয়েহেন। কাজেই তাঁৰ ক্ষতিপূৰণ কৰতে হলে তাঁকে রোজ দু’ঘণ্টা আগে অফিসে আসতে হয় আর অফিসের পর দু’ঘণ্টা থেকে যেতে হয়। সেটাও পুরো দশ বছর ধৰে। বৰ্তমানে তাঁৰ বয়স সাতচল্লিশ, এখন থেকে বছরে তিনশো দিন যদি তিনি রোজ চার ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ কৰেন তা হলেই তাঁৰ ফাঁকিৰ ক্ষতিপূৰণ কৰা সম্ভব হবো।

খুব স্বাভাবিকভাবেই বনমালীবাবুৰ বশ ধ্বস্তরী দাস প্রচণ্ড অবাক হয়ে যান তাঁৰ এই আচরণে। কারণ কোনো সহকর্মীৰ মুখে তিনি এ ধরনের কথা কোনো দিন শোনেননি। তিনি বনমালীবাবুৰ ‘সৎ’ হওয়ার প্রচেষ্টাকে কার্যত ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন। কেননা এমন কোনো ব্যবস্থা তাঁৰ পক্ষে কৰা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, একজন লোক একটা পাওনার জন্য তিন মাস ঘুরছে। বনমালীবাবুৰ একটা কলমের আঁচড়েই লোকটা এগারো হাজার টাকা পেয়ে যায়। কিন্তু সৰ্বত্ৰই ‘দেবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে’ৰ খেলায় অভ্যস্ত সেই জনৈক লোকটি তাঁৰ ফাইল পাশ হয়ে যাওয়ার আশায় বনমালীবাবুৰ জন্য তিনশো টাকা খামে ভৰে নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি নেন মাত্ৰ দেড়শো টাকা। কারণ সরকারি কাজে মাইনে তো পাচ্ছেনই, তার ওপর আবার এত টাকা নিয়ে কী কৰবেন — “তিনি যা পেতে পারতেন, এবং যা এতদিন নিয়ে এসেহেন এবারে একেবারে বৈপ্লবিকভাবে তার অর্ধেক ঘুষ নেবেন একতরফাভাবে স্থির কৰলেন।”^৯ এর ফলে তিনি অফিসে ভয়ানক অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। অফিসের সহকর্মীরা তাঁকে এই মারে কী সেই মারে। কারণ সহকর্মী হলেও ঘুষ নেওয়াটা তাঁদের একছত্র অলিখিত আধিপত্যের মধ্যেই পড়ে। সেখানে বনমালীবাবুৰ এহেন ‘সৎ’ হওয়ার প্রচেষ্টা তাঁদের দীর্ঘদিনের সযত্নালিত নিয়মকে অনেকাংশে ধাক্কা দিয়েছিল।

এবার তাঁৰ হলো বিবেকেৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ। তিনি নিজেই নিজের প্রতিবন্ধকে ভেঙি কেটে বলছিলেন, বদম্যেশ দেশের শত্রু, চোর, ঘুষখোর নিপাত যা তুই। একজন কন্ট্রাক্টৰ তাঁৰ ফাইল পাশ কৰানোর জন্য বনমালীবাবুৰ হাতে পাঁচ টাকা ঘুষ দেন। বনমালীবাবু জানান ফাইল দু’দিন আগেই যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই টাকা তাকে ফেরৎ দিয়ে দেন। ছোট ছোট একটুকরো কথার মধ্যে কত ব্যঞ্জনা লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকে কত মাপা হাসি চাপা কান্নার অনুরণন। কত ভাললাগার শিহরন। ‘ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোট দুঃখ ব্যথার’ মুহূর্ত। এই সামান্য কন্ট্রাক্টৰটি জীবনে কোনো দিন কারো কাছে এত সম্মান পায়নি —

“বিশেষ কৰে অকস্মাৎ তাঁকে ‘স্যর’ সম্বোধন কৰাটা তাঁৰ কাছে ভয়ঙ্কৰ একটা ব্যাপার বলে মনে হল। তিনি আরও হতভম্ব হলেন যখন বনমালীবাবু বললেন, ভবিষ্যতে সামান্য কাজের জন্য এভাবে টাকা দিতে আসবেন না স্যর, তার চাইতে এই টাকাটা দান কৰুন সেই সব লোককে, যাঁরা বড় বড় কাজ কৰেহেন, যেমন চোর-ছাঁচড়, গুণ্ডাদের-আহা, তারা কত দুঃখে চোর হয়, ছাঁচোড় হয়, গুণ্ডা হয়।”^{১০}

সমাজের একটা বিশেষ দিককে চিহ্নিত কৰা হলেও এমন টুকরো টুকরো ভাললাগার আবেশের জন্য সাধারণ গল্পও হয়ে ওঠে অসাধারণ। কিন্তু বনমালীবাবুকে নিজের জীবন দিয়ে এই সততার মূল্য দিতে হয়।

অফিসের সহকর্মীদের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এভাবেই দেশে দেশে কালে কালে সততার ধ্বজাধারীদের মরতে হয়েছে।

ভিজিলেন্স অফিসারকে টুপি পরানোর এক মজাদার গল্প ‘ঐশ্বর্যের খোঁজে’। গল্পটি রচিত ১৯৯০ সালে। গৃহকর্তা অসীতেশ মুখার্জি এককথায় বেশ ধনী ব্যক্তি। প্রচুর টাকা খরচ করে তিনি বাড়ি তৈরি করেন। তাঁর বাড়িতে রয়েছে একটি সেলার। তাঁর যাবতীয় আয় সেই সেলার থেকেই। নিজের কথাতেই তাঁর ‘দৃশ্যমান’ আয় বছরে ষাট হাজার টাকা। কেবলমাত্র অর্থই মানুষকে যাবতীয় সুখ দেয় না। তার সঙ্গে দরকার হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রভাব এবং প্রতিপত্তি। তাই অসীতেশবাবুর স্ত্রী চলিতা দেবী বলেন — “এই বাজে জিনিস আছে বলে না কলকাতার সমাজে আমাদের স্থান কত উঁচুতে। গত তিন বছরে অন্তত এক ডজন টিভি সিরিয়াল পরিচালক ডজন ডজন অভিনেতা অভিনেত্রী, উকিল, অধ্যাপক, লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী এসে আমাদের এই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটেননি?”^{১১} তাই খুব সময়ে এহেন অসীতেশবাবু তাঁর প্রাক্তন বন্ধু (যাঁর সঙ্গে আগে সিমলায় একসঙ্গে কেরানিগিরি করেছেন) তথা ভিজিলেন্স অফিসার দারুওয়ালার জন্য সমস্তরকম সুবন্দোবস্ত করেন। খুব সুকৌশলে তাঁকে টুপি পরানোর যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি করে রাখেন। অসীতেশবাবুর এই বিশাল প্রতিপত্তি দেখে দারুওয়ালার একের পর এক প্রশ্নে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। জমির দাম জানতে চাইলে অসীতেশবাবু জানান, অনেক দিন আগে কেনা স্বশ্রুরমশাইয়ের দেওয়া এই জমি তিনি বরাতজোরে পেয়েছেন। বাড়ি তৈরির খরচ, ইটালিয়ান মার্বেল, মালমশলা সবই তিনি তাঁর বন্ধুর বদান্যতায় পেয়েছেন। এমনকি বাড়ি তৈরির লোহাও পেয়েছেন অদ্ভুতভাবে — “রেলের গুডস ইয়ার্ডে যে সব মাল বছরের পর বছর পড়ে থাকে কেউ ডেলিভারি নেয় না, সেইসব মাল নিলামে বিক্রি হয় — অনেক সময় আসল দামের একটা ভগ্নাংশমাত্র দিলেই মাল পাওয়া যায়।”^{১২} বাড়ি তৈরি হয়েছে কংক্রিট দিয়ে। বালি যেভাবে পেয়েছেন তার গল্প আরো মারাত্মক। তাঁর বাবা নাকি ছোটবেলায় অসীতেশবাবুর এক বন্ধুকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়িয়েছিলেন। সেই বন্ধু পরবর্তীকালে বালির ব্যবসায় লাভ করে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে বাড়ি তৈরির বালি উপহার দেন। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যে বলতে বলতে তিনি এত দূর সীমালঙ্ঘন করেছেন যে, সেখান থেকে আর ফিরে আসার উপায় থাকে না। আসলে অসীতেশবাবু বোঝেননি দারুওয়ালার ভিজিলেন্স অফিসার হলেও তাঁর মতো অনেক অসীতেশ মুখার্জিকে তাঁর দেখা আছে। এত কাণ্ড করেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। তাই তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য — “অসীতেশ, বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা বেশ কাহিল।”^{১৩} দারুওয়ালার ছলে-বলে-কৌশলে বুঝিয়ে দেন যে, অসীতেশের যা আছে থাকুক। তাঁর সমস্ত গোপনীয়তা ঢাকার জন্য তিনি মাত্র তিরিশ হাজার টাকার বিনিময়ে একটি নতুন মার্সিডিজ, অথবা রোলস রয়েস চান।

ভিজিলেন্স অফিসারের নামের মধ্যেই রয়েছে বড়ো এক চমক। কাল্পনিক চরিত্র, তাই যে কোনো নাম বা পদবি রাখাই যেত। কিন্তু লেখক বেছে নিয়েছেন দারুওয়ালার পদবিটিকেই। সেই অফিসারের নাম কী, তার উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। সমানে তাকে ‘দারুওয়ালার’, ‘দারুওয়ালার’ বলেই চিহ্নিত করে গেছেন। অন্তত শতাধিক বার। ‘দারু’ শব্দের মানে কী, তা পাঠকের অজানা নয়। অসীতেশের আয়ের উৎস যদি সেলার হয়, তবে তিনিও এক দারুওয়ালার। অন্যদের দারু খাইয়ে বোকা বানানো গেলেও দারুওয়ালার চলে পাতায় পাতায়। সে এমন অনেক ফন্দিফিকির জানে। তাই অসীতেশ যতই গল্প শুনিয়ে যাক, আসল সত্যিটা বুঝে নিতে দারুওয়ালার ভুল হয় না। কিন্তু সে সরাসরি ঘুষ চায় না। সে সব কথা নীরব শ্রোতা হয়ে শোনে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। উল্টো দিকের লোকটি অনর্গল মিথ্যে বলছে জেনেও দিব্যি তা হজম করেন। একটি বারও সন্দেহ প্রকাশ করে না। শেষ লগ্নে ঝুলি থেকে বেড়ালটিকে বের করে। তাও সুকৌশলে। যেন ওস্তাদের মার শেষ রাতে। সহজ বার্তা, তোমার যা আছে থাকুক। দরকারে সেই সম্পদ আরো বাড়ুক। আমার তাতে কী? আমার ভাগটা বুঝিয়ে দিলেই হলো। পড়তে পড়তে পাঠকও বুঝবেন, অসীতেশ আগাগোড়াই মিথ্যে বলছেন। কথার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতাও নেই। আসলে লেখক বোধহয় বোঝাতে চেয়েছেন, উটকো বড়োলোকদের অনেকরকম শখ হয়। শুধু টাকা থাকলেই হলো না। তখন সে খ্যাতি চায়, প্রতিষ্ঠা চায়। জ্ঞানীগুণী লোকদের সান্নিধ্যও চায়। সমাজের কেঁটবিল্টুদের সঙ্গে

তাৰ ওঠা বসা, এটা জাহিৰ করতেও সে চেষ্টাৰ ত্ৰুটি ৰাখে না। ‘স্টাটাস সিঙ্কল’ শব্দ দুটো তাৰ জীৱনৰ সঞ্জে ওতপ্ৰোতভাবে জড়িয়ে যায়।

এমনই আৰেকটি বেশ মজাৰ গল্প ‘দাৰিদ্ৰ্যসীমাৰ নিচে সাড়ে সাত ঘণ্টা’। যে মানুহ যেটা পায় না সেটা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। বামনেরও তো শখ হয় চাঁদে হাত দেওয়ার। গল্পের শুরুরটা ভাৰি সুন্দর — “মনসিজ দত্ত দাৰিদ্ৰ্যসীমাৰ প্ৰায় দেড় বিঘা নিচে মোটামুটি বেশ কুকুৰকুণ্ডলী পাকিয়ে শূয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি দাবুণ দাবুণ সব লোকের সঞ্জে মিশেছেন... ওঁদের মধ্যে চারজন আবার নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন, একজন পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার।”^{১৪}

মনসিজ দত্ত যখন এমন স্বপ্ন দেখছে তখন তাঁর বিরানব্বই ছিল কহলে যা নাকি শত ছিল হতে আর অল্প বাকি তাঁর মধ্যে দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকে যায়। এই মনসিজ দত্তের বন্ধু বিৰাট ভদ্র। আমরা আগেই বলেছি, হিমালীশের গল্পে চৰিত্ৰের নাম বড়োই অদ্ভুত। এই নাম শ্ৰেণি চৰিত্ৰের প্ৰতিনিধিত্ব করে। এই দুই বন্ধু সাত বছর ধৰে ব্যবসা করে দাৰিদ্ৰ্যসীমাৰ ওপরে ওঠাৰ জন্য ব্যাঙ্ক থেকে দেড় লাখ টাকা লোন পেতে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশটা আবেদন করেছিল। তাঁদের লোন মঞ্জুর হলেও সরকারি সুনীতি বজায় রাখাৰ জন্য তাঁদের সঞ্জে আরো চাৰজনৰ নাম যুক্ত করা হয়েছে। এই দেড় লাখ টাকার চেক চাৰজনকে দিতে হবে এক লাখ টাকা ভাঙানোর সময়েই এবং সেই কারণে তাদের ঋণমেলায় যেতে হবে। বাকি পঞ্চাশ হাজাৰ টাকা দিয়ে তাঁরা বেড়ালের চামড়া পাৰস্যে রপ্তানি করে লাভ হওয়ার এক অভিনব ব্যবসা করার দিৱাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে।

ধাপাৰ মাঠে সরকারের এই ঋণমেলা করার অর্থ খুব সহজ। সামনেই ভোট আসছে। কেন্দ্ৰীয় সরকার বিৰোধীদের কথায় ঋণমেলা মানে ভোটদাৰদের ঘুষ দেওয়া। কিন্তু ধাপায় কোনো নিৰ্বাচন নেই। তা সত্ত্বেও ঋণমেলা বসানো হলো। কিন্তু সেখানেও কাৰচুপি — “ঋণমেলা থেকে ওঁরা যা জানতে পাৰলেন তা ভয়াবহ। পঞ্চাশ হাজাৰ টাকা পাওয়ার সঞ্জে সঞ্জে কী এক ফাভে দিতে হবে শতকরা পনেরো ভাগ। শতকরা ত্ৰিশ ভাগ দিতে হবে নানা সহৃদয় অফিসাৰকে। বাকি ৰইল পঁচিশ হাজাৰ। এই পঁচিশ হাজাৰ ঋণ দেওয়া হবে শতকরা তিন টাকা সুদে। দেখা গেল ওদের দু’জনের ধাৰই রয়েছে এৰ-ওৰ কাছে বাইশ হাজাৰ। বাকি ৰইল তিন হাজাৰ।”^{১৫}

মাত্ৰ তিন হাজাৰ টাকা দিয়ে কোনো ভদ্রস্থ ব্যবসা যখন করা সম্ভব নয়, তখন সেই টাকা তাঁরা ৰেস খেলে শেষ করে। তাৰপৰ অনেক কিছু ভালমন্দ খাওয়ার পৰ বিল হয় ছশো সাতাত্তৰ টাকা সত্তৰ পয়সা। এভাবেই সমাজের বিভিন্ন বিষয়কে তাঁর গল্পের উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন হিমালীশ গোস্বামী। তবে চাঁচাছোলা দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়; এক সহানুভূতিপ্ৰবণ মন নিয়েই তিনি সমাজকে কলুষমুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্ৰ:

১. ‘৫০টি গল্প হিমালীশ গোস্বামী’, অলক চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্ৰকাশ খান, আজকাল পাবলিশাৰ্স প্ৰাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টৰ ৫, কলকাতা ৯১, জানুআৰি ২০১৬, পৃ. ৬
২. ‘সৰস ৰচনা সম্ভাৰ’, দাৰ্শনিক শোপেনহাউৰ, বিদ্যুৎ ৰায়চৌধুৰী, সাহিত্য সৃজনী, বি বি ১১/এফ, বিধাননগৰ, কলকাতা ৬৮, জানুআৰি ২০১৮, পৃ. ৩২
৩. ওই, পৃ. ৭২
৪. ‘৫০টি গল্প হিমালীশ গোস্বামী’, হিমালীশ গোস্বামী, জ্যোতিপ্ৰকাশ খান, আজকাল পাবলিশাৰ্স প্ৰাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টৰ ৫, কলকাতা ৯১, জানুআৰি ২০১৬, পৃ. ১১৩
৫. ওই, পৃ. ১১৬
৬. ওই, পৃ. ১১৭
৭. ওই, পৃ. ১১৮
৮. ওই, পৃ. ১২১
৯. ওই, পৃ. ১২৩

১০. ওই, পৃ. ১২৪
১১. ওই, পৃ. ১৪১
১২. ওই, পৃ. ১৪৫
১৩. ওই, পৃ. ১৪৬
১৪. ওই, পৃ. ১৪৮
১৫. ওই, পৃ. ১৫৩

লেখক পরিচিতি: অন্তরা চৌধুরি, সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, ভাগলপুর ন্যাশনাল কলেজ, ভাগলপুর।